ঢাকা, ২ এপ্রিল ২০১০। ১৯ চৈত্র ১৪১৬। ১৬ রবিউস সানি ১৪৩১। বর্ষ ১। সংখ্যা ১২২। দ্বিতীয় সংস্করণ www.kal

আংশিক নয় পুরো সত্য

কালের কণ্ঠ

স্পটলাইট

ময়ূরপঙ্খি

বজরার মতো এটিও ভারতবর্ষের নবাব ও জমিদারদের নৌযান। এটির সামনের অংশটি ময়ূরের মতো দেখতে হয় বলে এর নাম ময়ূরপঙ্খি। এ নৌকার কথা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে বেশ পাওয়া যায়। অঞ্চলভেদে ময়ূরপঙ্খির নকশা খানিকটা পরিবর্তন দেখা যায়। ছবির এ নৌকাটি ময়মনসিংহ এলাকার। সাত থেকে দশজন যাত্রী ধারণক্ষম এ নৌকা চালাতে লাগে চারজন মাঝি। এটি দৈর্ঘ্যে ১১ দশমিক ৪০ থেকে ১৩ দশমিক ৭৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

হঠাৎ করেই শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে উঠে এসেছে এত্ত নৌকা! কত রকম আর কী যে রঙিন এদের বেশভূষা! চলছে পাল উড়িয়ে, দাঁড় বেয়ে! তবে এগুলো কিন্তু মডেল নৌকা। জাদুঘরে এরা এভাবেই থাকবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত

নাও

ছাইড়া দে পাল উড়াইয়া দে

চন্দন চৌধুরী ▶

জাতীয় জাদুঘরে ঢুকে সিঁড়ির বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গেলে মনে হবে, প্রদর্শনীতে নয়, আপনি হয়তো একটা নৌকায় ঢুকছেন। কারো যদি নৌকায় চড়ার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে বড়সড় ছইয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে এমনটাই মনে হতে পারে। ছই তৈরি হয় মুলিবাঁশ দিয়ে। এর ভেতরটা অনেকটা ঘরের মতো। ভেতরে একপাশে রাখা কয়েক বস্তা পাট, অন্য পাশে মালামাল। নৌকায় রান্না করার জন্য একটি মাটির চুলাও আছে। তার ওপর রাখা একটি মাটির হাঁড়ি। তাক দুটির একটিতে রয়েছে ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং আগুন জ্বালানোর লাকড়ি। এর একপাশে আছে হ্যারিকেন, কুপি, মাটির পাত্র, ডুলা ইত্যাদি। একটু সামনে এগিয়ে যেতেই ভাববেন, এ দেখি এলাহী কাণ্ড! নৌকা আর নৌকা! মনে হতে পারে, এগুলো খেলনা। হ্যাঁ, আকৃতিতে খেলনা হলেও প্রকৃত নৌকার মাপজোখেই এগুলো তৈরি।'—বললেন আয়োজকদের একজন, ফ্রেন্ডশীপের নির্বাহী পরিচালক রুনা খান। তাঁর মতে, মাপ নিয়ে এই নৌকাগুলো বড় আকারে তৈরি করা যাবে।

পানিবেষ্টিত অঞ্চল হওয়ায় সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে অনেক ধরনের নৌকার চল ছিল। মাত্র কয়েকটি ছাড়া কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে প্রায় সবই। যাতায়াত, কৃষি-পরিবহন, মালামাল বহন ছাড়াও আগে যুদ্ধেও ব্যবহার হতো নৌকা। বাংলার নৌকার প্রাচীন ঐতিহ্য তুলে ধরতেই জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী রুমে এই আয়োজন। বাংলাদেশের ৫৭ ধরনের নৌকা রাখা হয়েছে এতে।

আয়োজন করেছে ফ্রেন্ডশীপ। আয়োজক সংস্থার উপদেষ্টা ইভ মার বলেন, 'নৌকা নিয়ে বাংলার যে ঐতিহ্য, তা একেবারেই নিজস্ব। পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলের সঙ্গে এর মিল নেই।' জাদুঘরের সামনে রাখা কাঠের নৌকা দুটি পানিতে চলত একসময়। বাংলাদেশের নৌকা দুই শ্রেণীর—নদীর ও সমুদ্রের নৌকা। নদীর নৌকার সবই বাংলার নিজস্ব। অন্যদিকে, সাগরের নৌকার ক্ষেত্রে বিদেশি নৌকার প্রভাব রয়েছে। যেমন, দাঁড়ের কথাটি চিন্তা করলেই দেখা যায়, চীনারাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দাঁড় ব্যবহার করে নৌকার ঠিক মাঝামাঝি। কিন্তু একমাত্র এ দেশেই দাঁড়টি থাকে নৌকার একপাশে। এটা পৃথিবীর অন্য কোনোখানে নেই; এবং এই ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন, কয়েক হাজার বছরের।

কত্ত রকম নৌকা রে বাপ!

বাংলাদেশে যেমন আছে নদী, তেমনি আছে নৌকা। চলাচল, পরিবহন, কৃষিকাজ, ভ্রমণ—সবকিছুতেই ছিল আলাদা ধরনের নৌকা। প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে ৫৭ ধরনের ১০২টি নৌকা। বাঁশের র‍্যাকের কয়েক সারিতে রাখা নৌকাগুলো। এক সারিতে রয়েছে সমুদ্রের নৌকাগুলো। এগুলো সাধারণত বিদেশি প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি। এই র‍্যাকটি পেরিয়ে পরে ডানদিকের র‍্যাকে রাখা আছে ঢাকা অঞ্চলের নৌকাগুলো। আপনি দেখতে পাবেন চাঁদপুরের ঘাসি ও পালকি, চট্টগ্রামের সাম্পান, টেম্পো ও গুলুক, ময়মনসিংহের ময়ূরপঙ্খি ও তাবোড়ি, সিরাজগঞ্জের বেদি, রাজশাহীর বাসারি ও জোড়া নৌকা, কিশোরগঞ্জের পাতাম, খুলনার পর্দি, পাবনার পানসি, মালার, ডিঙি ও কোষা, বরিশালের বাজিপুরী, সিলেটের গসতি, গোপালগঞ্জের করপাই, সাভারের পালোয়াড়ি, পালটাই ও বেদে নৌকা, ফরিদপুরের বিক এবং গাইবান্ধার ফেটিসহ আরো কত্ত নৌকা! তবে এর মধ্যেও নজর কাড়বে বাঁশের তৈরি ক্রাফট নৌকা, জোড়া নৌকা ও ডঙ্গা নৌকা। আবার আট প্রকার ডঙ্গা নৌকাকে বৃত্তাকারে রেখে সাজানো হয়েছে চারদিকে পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ার মতো।

বানানো হয় যেভাবে

আদিকালে নৌকা তৈরি হতো বড় কাঠের গুঁড়ির মাঝখানটা খোদাই করে। পরে বাঁশ, বেত, চামড়া এবং কাঠের আঁটি বেঁধে নৌকা তৈরি করা হতো। তবে শেষ পর্যন্ত কাঠই ছিল নৌকা তৈরির প্রধান উপকরণ। কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরির বিষয়গুলোকে খুব ভালোভাবেই স্থান দেওয়া হয়েছে প্রদর্শনীতে। কাঠ চেরাইয়ের আঙ্গিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটি আস্ত কাঠের গুঁড়ি ও করাত। দেখে মনে হবে, কাঠ চেরাই করা হচ্ছে। চেরাই করা কাঠকে বলা হয় তক্তা। এই তক্তা দিয়েই বানানো হয় নৌকা। নৌকা তৈরিতে লাগে পেরেক, গজাল, তারকাঁটা ইত্যাদি। তা ছাড়া ছই বানাতে লাগে মুলিবাঁশ। গজাল মেরে নৌকার বডি যখন বানানো হয়, তখন নৌকাকে বিশেষ কায়দায় কাত করে রাখা হয়। তবে ছোট কোষা নৌকা বানানোর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার না করলেও চলে। কারণ, ছোট্ট কোষা নৌকাকে কাঠ দিয়ে ঠেস দিয়ে কাত করে তৈরির কাজ করা যায়। কিন্তু বড় নৌকা বানানোর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির বিকল্প নেই।

আমরা ভাই কাঠমিস্ত্রি, নাও বানাইয়া খাই...

মিস্ত্রিদের জন্য রয়েছে একটি থাকার ডেরাঘর। এগুলো সাধারণত হয়ে থাকে নদীর তীরে। একটি বড় নৌকা তৈরি করতে অনেকদিন সময় লেগে যায়। তাই নৌকা তৈরির সময় মিস্ত্রিরা এই ঘরে বসবাস করে থাকে। ডেরায় কয়েকটি বিছানা থাকে, তাকও থাকে কিছু। তাকে থাকে মিস্ত্রিদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র। ঘরটির পাশেই থাকে আগুনের চুলা। এখানেও চলছে যেন নৌকা তৈরির কাজ। এই ছোট আকৃতির নৌকাগুলো তৈরি করেছেন আসল কাঠমিস্ত্রিরাই।

সিরাজগঞ্জের বাঙ্গা সূত্রধর এই নৌকাগুলো তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে ২০ জন কারিগর। কারিগরদের একেকজনের একেক কাজ—কারো কাঠের, কারো বাঁশের, কারো রঙের। ডেরার সামনে টুংটাং শুনে মনে হতে পারে, এখনো চলছে নৌকা তৈরির কাজ।

এ ছাড়া প্রদর্শনীতে রয়েছে নৌকার একটি বড় দাঁড়, জ্বালানি কাঠ বোঝাই নৌকা, মালবোঝাই নৌকা এবং একটি নৌকার ধ্বংসাবশেষ।

প্রদর্শনী চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টা থেকে চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। যাঁরা ঢাকার বাইরে থাকছেন, তাঁরা দেখে নিতে পারেন www.friendship-bd.org/exhibition সাইটটিতে।

কোথা থেকে আসে রে নাও

রিদওয়ান আক্রাম ▶

কতকগুলো কাঠ একসঙ্গে বেঁধে ভেলা বানিয়ে কিংবা আস্ত কাঠের গুঁড়ি দিয়েই হয়তো তৈরি হয়েছিল বাংলার প্রাচীনতম নৌকা। এই নৌকাই আকারে বড় হলে পরিণত হয় জাহাজে, পাড়ি দেয় সমুদ্র। খ্রিস্টীয় ষাটের দশকে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সি' বইয়ে পাওয়া যায় এমনই সব বড় নৌকা বা জাহাজের কথা। 'কোলানদিয়া' নামের এই জাহাজগুলোতে করে প্রাচীন গাঙ্গেয় বন্দর থেকে মসলিন, পিঁপুল, তেজপাতা বিদেশে রপ্তানি হতো। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 'মিলিন্দ পান হো'তে উল্লিখিত নাব্য দেশগুলোর মধ্যে 'বঙ্গ'-এর নাম পাওয়া যায়। এই বঙ্গের মানুষ ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যেতেন চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা ও সুমাত্রার মতো দূর-দূরান্তে। এ জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাদের পাড়ি দিতে হতো সমুদ্র। আর সমুদ্র পাড়ি দেওয়া হতো বাংলার নৌকা বা জাহাজ দিয়ে। সেসব নৌযান কেমন ছিল? চাক্ষুষ প্রমাণ মিলবে জাভার বিখ্যাত বারোবুদুর মন্দিরে। সেখানে উৎকীর্ণ নৌযানগুলোই পূর্ববঙ্গের নৌকার প্রাচীনতম নিদর্শন। চীনা পর্যটক ফা হিয়েনের ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায়, ৪০০ খ্রিস্টাব্দ বাংলায় নৌবন্দর ছিল তাম্রলিপ্তিতে। ফা হিয়েনেরই আরেক দেশি ভাই হিউয়েন সাঙও বাংলায় এসেছিলেন। ৬৩৯ থেকে ৬৪৬ সাল পর্যন্ত এ দেশে থাকাকালে কোনো এক সময় তিনি হাজির হন পুণ্ড্রনগরীতে। সেখানে তিনি নদী ও সমুদ্রগামী বিশাল বিশাল নৌকা তৈরি করতে দেখেছিলেন। আর এগুলো তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে। কোন কোন কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করা হতো, তার বর্ণনা পাওয়া যায় কবি কঙ্কনের 'চণ্ডীকাব্যে'। তাতে উল্লেখ আছে— তমাল, কাঁঠাল, তাল, শাল, পিয়াল এবং গাম্ভারি কাঠের কথা। এসব কাঠ প্রক্রিয়াজাত করে ক্ষয় প্রতিরোধ করা হতো। কাঠ শুকিয়ে এবং পানিতে ভিজিয়ে এর স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করা হতো। পরে আলকাতরা আবিষ্কারের পর নৌকার গায়ে তা লেপে দেওয়ার চল শুরু হয়। নৌকা তৈরি করা হতো কাঠের টুকরাগুলো ছোট ছোট লোহার পাত দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া দিয়ে—অনেকটা স্টেপলারের পিন দিয়ে কাগজ মোড়ানোর মতো করে। হাজার বছর ধরে মোটামুটি এভাবেই বাংলায় নৌকা প্রস্তুত হয়ে থাকে। অষ্টম ও নবম শতকের সময় থেকে বাণিজ্যের জন্য আরবরা এ দেশে আসতে থাকে। তাদের জাহাজ প্রথমে ভিড়ত চট্টগ্রাম বন্দরে। তখন সমুদ্রবন্দর এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বিদেশি ব্যবসায়ীরা এখান থেকে জাহাজ বানিয়ে নিয়ে যেত। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতাও বাংলায় এসেছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে। সেটা ১৩৪৬ সালে। সেখান থেকে তিনি নদীপথ হয়ে তখনকার প্রসিদ্ধ নগর সোনারগাঁয়ে আসেন। চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁয়ে আসার পুরো যাত্রাটি ছিল নৌকায়। সে ভ্রমণ থেকে বলা যায়, তখনকার বাংলায় নৌকায় থাকত ঢাকি। তারা ঢাক বাজিয়ে এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় সংবাদ আদান-প্রদান করত। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, বাংলার সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতেও নৌকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বাহন। বারো ভুঁইয়ার সময় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল, যেমন— খিজিরপুর, শ্রীপুর, বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল) এবং যশোরে গড়ে উঠেছিল নৌঘাঁটি। মোগলদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নৌশক্তি বেশ কাজে লেগেছিল বারো ভুঁইয়ার মতো স্থানীয় জমিদারদের। পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন নৌযুদ্ধে পরাজয়ের পর মোগলরাও বাধ্য হয়েছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে। আর এই নৌবাহিনীই সুবে বাংলায় মোগলদের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরেছিল। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায়, বাংলায় মোগল নৌবহরের সদরঘাট ছিল ঢাকায়। ওই সময় নৌ দপ্তর পরিচিত ছিল 'মীর বহরি' নামে। আর নৌবহরকে বলা হতো 'নওয়ারা'। 'মীর বহরি'র কার্যক্রমের প্রধান কয়েকটি বিভাগ ছিল। এগুলো হচ্ছে জাহাজ নির্মাণ, সংগ্রহ ও পরিচালনার জন্য নাবিক, কারিগর ও পরিচালক নিয়োগ; নৌ চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ চলাচল সম্পর্কিত মাসুল ও কর আদায়। বারো ভুইয়াকে দমন করার পরও মোগলদের কাছে নৌবাহিনীর গুরুত্ব কমে যায়নি। বাংলার সুবেদার মীর জুমলা-শায়েস্তা খাঁর বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে বাংলার নৌকার উপস্থিতি ছিল সদর্পে। তাঁদের নৌবহরে থাকত 'কোশ', 'জলবা', 'ঘ্রাব', 'পারিন্দা', 'বজরা', 'পাতেল', 'সলব', 'পাতিল', 'বহর', 'বালাম', 'রথগিরি', মহালগিরি' এবং 'পাসওয়ার'। এসব নৌকায় কামান যুক্ত করে এগুলোতে রণতরীতে পরিণত করা হতো। কখনো কখনো মোগলরা তাদের নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্য পর্তুগিজ, ইংরেজ এবং ফরাসিদের নিয়োগ দিত; আবার কখনো বা প্রয়োজনে বাধ্যও করত। বাংলায় কত ধরনের নৌকা ছিল বা আছে— এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের বেশ জায়গা আছে। কেননা, মধ্যযুগের নানা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের জলযানের কথা উল্লেখ রয়েছে। সেসব নামের নৌকা কি একই নামে আছে, নাকি সময়ের পরিক্রমায় নাম পরিবর্তিত হয়েছে, সেই বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে নজর দেওয়া যাক প্রাচীন বাংলার নৌকার দিকে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য 'যুক্তিকল্পতরু'র উল্লিখিত নৌকাগুলোর কক্ষ বা কামরাগুলো সাজানো হতো স্বর্ণ, রুপা এবং তামার পাত দিয়ে। পাশাপাশি রংও করা হতো। দ্বিশৃঙ্গযান হলুদ রঙে, ত্রিশৃঙ্গযান লাল রঙে এবং একশৃঙ্গযান নীল রঙে রাঙানোর রীতি ছিল। সেই সময় নৌকাগুলো মোটা দাগে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হতো— ১. অগ্রমন্দিরা : প্রবাসযাত্রা ও যুদ্ধে ব্যবহৃত নৌকা; ২. মধ্যমন্দিরা : বর্ষাকালে অভিজাত শ্রেণীর প্রমোদতরী; ৩. সর্বমন্দিরা : রাজধন, অশ্ব ও পুরনারী বহনকারী নৌকা। ১০ রকমের বড় নৌকার মধ্যে ছিল—বেগিনী, দীর্ঘিকা, তরণী, ধরণী, লোলা, প্লাবিনী, জঙ্ঘলা, গয়ড়া, গামিনী এবং তরী। আবার ছোট নৌকাও ছিল ১০ রকমের—ক্ষুদ্রা, মন্থরা, গর্ভরা, মধ্যমা, ভীমা, পটপুটা, দীর্ঘা, চপলা, পটলা ও অভয়া।

মধ্যযুগের সেই সময়কার কিছু নৌকা বহাল তবিয়তে আজও টিকে আছে—মধুকর, রাজবল্লভ, রাজহংস, সমুদ্রফেন, শঙ্খচূড়, উদয়তারা, রত্নপতি, ময়ূরপঙ্খি, কাজলরেখা, কোষা, বজরা, ভাওয়ালি, ছিপ, ডিঙি, ওয়ার, পটল, পানসি, গেরদারি, কুমারিয়া, ঘাসি, জেলে ডিঙি, গয়না, পানুয়া, নাওধুরী, সরেঙ্গা, ডোঙা, ডেঙি, খেলনা, জংভেদী, সাম্পান, বালাম, গোধা, স্লুপ, কোন্দা, কাঠামি, এক মাল্লাই, দো মাল্লাই, টাপুরা, কেয়ারা, বাছারি ইত্যাদি।

১৮৮৫ সাল থেকে পূর্ববঙ্গে রেলপথ চালু হওয়ার পর থেকে নৌকার আধিক্য কিছুটা হলেও কমতে থাকে। তবে নৌকার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে। কেননা, এ সময় বড় বড় নদীর ওপর দিয়ে সেতু তৈরি হয়ে যায়, যা স্বল্প সময়ে সড়কপথে যাত্রী এবং পণ্য বহনে সহায়তা করে। এরপর কাঠের দুষ্প্রাপ্যতা আর শ্যালো মেশিনের কারণে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা হার মেনেছে স্টিলবডির নৌকার কাছে।

বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকার সারি, ইংরেজ আমল, শিল্পী অজ্ঞাত

বাংলার নৌকা

বজরা

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় এবং স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বেশ জনপ্রিয় নৌযান। আরাম-আয়েশের সব সুবিধা ছিল এর ভেতর। খাবারদাবার, কাপড়চোপড় থেকে শুরু করে চাকরবাকর সবকিছুর আয়োজন থাকত বজরায়। এ নৌকার দুই-তৃতীয়াংশ জায়গাজুড়ে ছিল থাকার কক্ষ। ঘরবাড়ির মতো এসব কক্ষে থাকত জানালা। কোনো কোনো বজরায় পালও থাকত। এসব বজরা দীর্ঘযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হতো। ছবির এ বজরাটি সিরাজগঞ্জ-পাবনা অঞ্চলের। এতে যাত্রীর ধারণক্ষমতা সাত থেকে ১০ জন। আর এটির মাঝি থাকত চারজন। এর দৈর্ঘ্য ১৩ দশমিক ৭২ মিটার থেকে ১৪ দশমিক ৬৫ মিটার, প্রস্থ ২ দশমিক ২৫ থেকে ৩ দশমিক ২০ মিটার।

বাইচ

দেশের অনেক অঞ্চলে বাইচের নৌকা ছিল এবং এখনো তার কিছু টিকে আছে। বাইচের জন্য ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের নৌকা।
ঢাকা, ময়মনসিংহে কোষা নৌকা; টাঙ্গাইল ও পাবনায় লম্বা ছিপছিপে নৌকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটে সারেঙ্গি নৌকা; চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সন্দ্বীপে সাম্পান-জাতীয় নৌকা, ফরিদপুরে গয়না-জাতীয় নৌকা ব্যবহার হয়। বাইচ নৌকা সাধারণত সরু এবং লম্বায় ১৫০ থেকে ২০০ ফুট।
প্রতিযোগিতার সময় ৭, ২৫, ৫০ বা ১০০ জন মাঝি থাকতে পারে। মুসলিম শাসনামলে নবাব-বাদশাহরা নৌকাবাইচের আয়োজন করতেন।
নৌকার গতি অনুসারে রাখা হয় সুন্দর সুন্দর নাম—পঙ্খীরাজ, ঝড়ের পাখি, সাইমুন, তুফান মেল, অগ্রদূত, দ্বীপরাজ, সোনারতরী ইত্যাদি।

ডিঙি

বাংলার নৌকার সবচেয়ে প্রচলিত ধরনটি হচ্ছে ডিঙি। নদীর পাড়ে কিংবা জলাশয়ে খুব কাছাকাছি থাকা লোকজন সারাক্ষণ তাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে এটি ব্যবহার করে থাকে। একজনই এটিকে চালানোর জন্য যথেষ্ট। সাধারণত এটির দৈর্ঘ্য ৫ দশমিক ৫০ থেকে ৭ দশমিক ৬০ মিটার হয়ে থাকে। বৈঠা দিয়ে ডিঙি বাওয়া হলেও কখনো কখনো পাল ব্যবহার করা হয়।

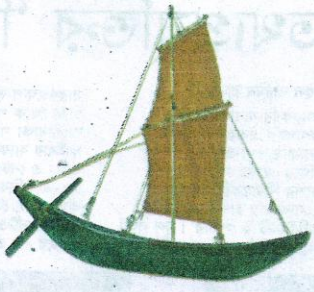

সাম্পান

সমুদ্র এলাকার নৌকা। সামনের দিকটা বাঁকানো চাঁদের মতো হলেও পেছনের দিকটা একরকম সোজা বলা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ'তে সাম্পান সম্পর্কে লিখেছেন, 'দেখতে এটি হাঁসের মতো। এটি তৈরি হয়েছে চীন দেশের নৌকার আদলে।'
সাম্পানের সামনের অংশটি জোয়ারের সময় সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে সামনে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। দুই ধরনের সাম্পান আছে। সমুদ্র উপকূলের আশপাশে চলার জন্য ছোট সাম্পান আর সমুদ্রে চলাচলের জন্য বড় সাম্পান। এসব সাম্পান দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে ৫ দশমিক ৪০ মিটার থেকে ৬ দশমিক ১০ মিটার এবং ১২ দশমিক ৮০ থেকে ১৪ দশমিক ৬৫ মিটার হয়ে থাকে।

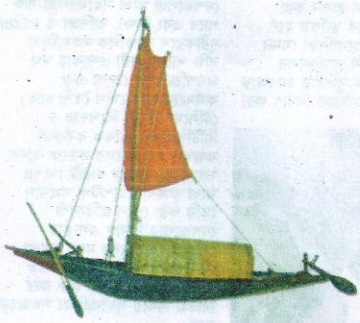

কোষা

দেশের সব অঞ্চলেই কোষা দেখা যায়। অঞ্চলবিশেষে এর আকৃতি সামান্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। আকারে ছোট, অনেকটা পারিবারিক নৌকা বলা যায়। বর্ষাকালে আমাদের চরাঞ্চলগুলোয় এ নৌকার আধিক্য দেখা যায়। একটি কোষা নৌকাতে তিন থেকে আটজনের মতো যাত্রী বসতে পারে। এগুলো খেয়ানৌকা হিসেবেও এখন ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু কোষায় পাল, কোনো কোনোটিতে আবার ছইও থাকে। সাধারণত ভাড়ায়চালিত কোষার ক্ষেত্রে পাল ও ছইয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। কোষা লম্বায় ৬ দশমিক ৪০ থেকে ৯ দশমিক ১০ মিটার, প্রস্থে ১ দশমিক ৭৫ থেকে ৩ দশমিক ৩৫ মিটার হয়ে থাকে। এর মাঝি থাকে একজন। কখনো কখনো দুজনও হয়ে থাকে।

পাতাম

এটি দেখা যেত সিলেট ও কিশোরগঞ্জে। মালবাহী নৌকাটির নামকরণ হয়েছে 'পাতাম' শব্দ থেকে। এই পাতাম একধরনের লোহার কাঁটা। এটি দিয়ে দুটি কাঠকে জোড়া লাগানো হয়ে থাকে। নৌকার বডির কাঠগুলো জোড়া লাগানো হতো পাতাম দিয়ে। এমন করে লাগানো হতো যেন নৌকার ভেতরে কোনো ধরনের পানি ঢুকতে না পারে। প্রয়োজনে পাতাম লাগানোর জায়গায় দুই কাঠের মাঝখানে দেওয়া হতো পাটের আঁশ। পাতাম নৌকা ছয় থেকে ৪৪ টন পর্যন্ত বহন করতে পারে। এতে মাঝি থাকে পাঁচজন।
নৌকাটি লম্বায় ১০ থেকে ১৮ মিটার, প্রস্থে ২.৫ থেকে ৪ দশমিক ৩০ মিটার এবং এর গভীরতা দশমিক ৬৪ থেকে ১ দশমিক ০৫ মিটার। এর একটি পাল ও দুটি বৈঠা। নৌকাটি এখন বিলুপ্তপ্রায়।

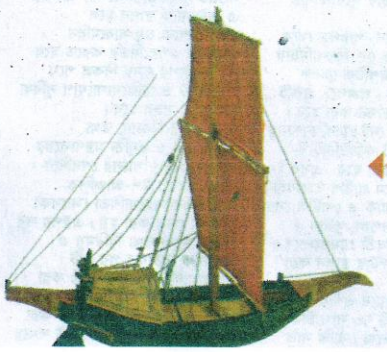

বিক

ফরিদপুর অঞ্চলের মালবাহী নৌকা। প্রায় দুই যুগের বেশি সময় আগে নৌকাটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহনক্ষমতা ২৫ থেকে ২৮ টন। এতে মাঝি থাকে সাত থেকে ৯ জন। নৌকাটি লম্বায় ১২ থেকে ১৫ দশমিক ২৫ মিটার, প্রস্থে ৩ দশমিক ০৫ থেকে ৩ দশমিক ৮০ মিটার এবং এর গভীরতা দশমিক ৯০ থেকে ১ মিটার। এর পাল দুটি, বৈঠা থাকে ছয়টি। দুই পালের মাঝখানটা একটি বাঁশের সঙ্গে লাগোয়া। নৌকার ছইটি থাকে পেছনের দিকে এবং আকারে